গীতা কোর্স

পাঠ্যগ্রন্থ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

প্রণীত

BHAGAVAD-GITA AS IT IS অবলম্বনে সংকলিত

সংকলন ঃ গোবর্দ্ধন গোপাল দাস

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট

শ্রীমায়াপুর, কোলকাতা, মুম্বই, নিউ ইয়র্ক, লস্ এঞ্জেলেস, লণ্ডন, সিডনি, প্যারিস, রোম, হংকং

GITA-COURSE TEXT BOOK
Bengali

প্রকাশক ঃ
ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের পক্ষে
শ্যামরূপ দাস ব্রহ্মচারী

অখণ্ড সংস্করণ ঃ ৩,০০০ কপি, ২০১১

গ্রন্থ-স্বত্ব ঃ
১৯৯৮ ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট
কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

পত্রবিনিময় ও যোগাযোগ ঃ

ভারত ও বিশ্ব :
গীতা প্রচার বিভাগ
(ভক্তিবেদান্ত গীতা অ্যাকাডেমী)
ইসকন, মায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দির
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ
ফোন - (০৩৪৭২) ২৪৫০৬৪,

বাংলাদেশ :
শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ মন্দির
চন্দ্রমোহন বসাক স্ট্রীট
ওয়ারী (বনগ্রাম),
ঢাকা - ১২০৩
বাংলাদেশ

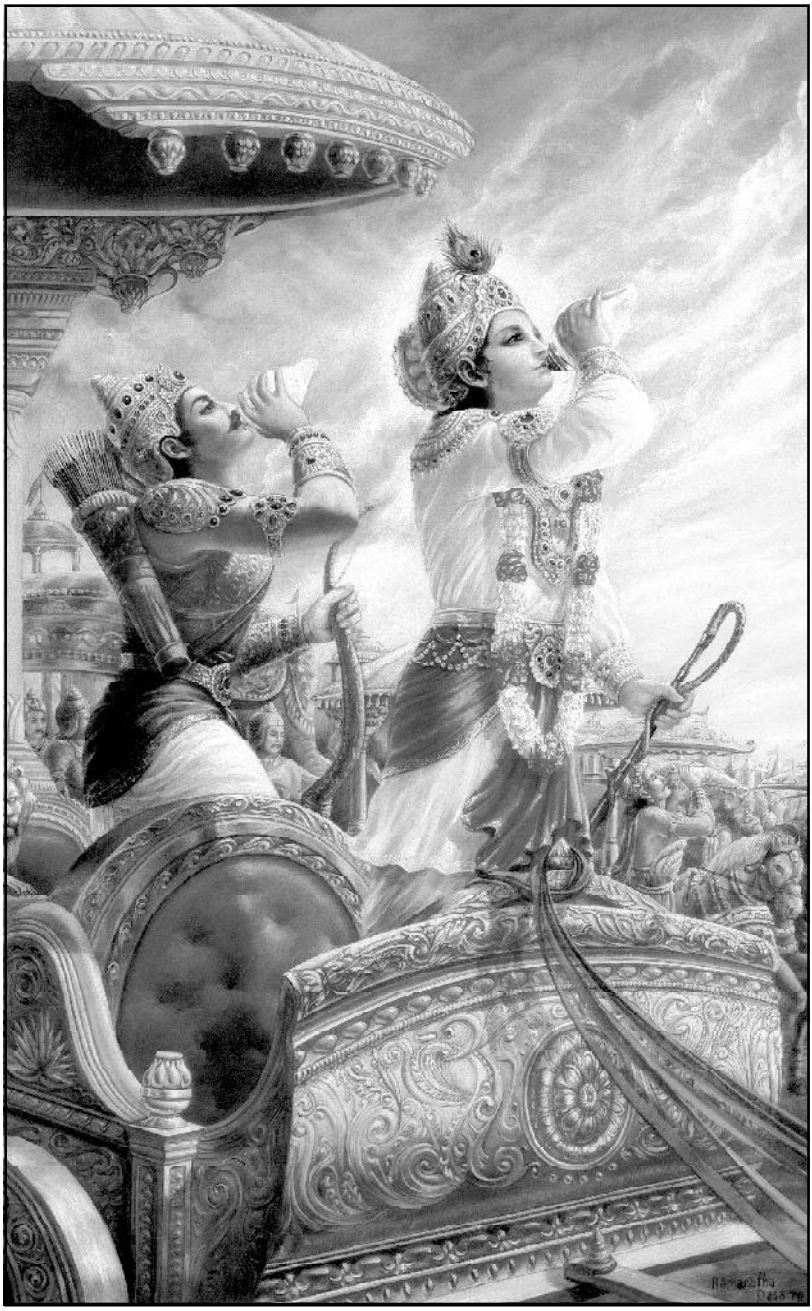

প্রাক্‌কথা

গীতা কোর্স কেন

আমরা প্রায় সবাই স্কুল-কলেজে কম-বেশি ইতিহাস-সাহিত্য বিজ্ঞান-দর্শনের জ্ঞান লাভ করেছি। জীবনের সমস্যা সমাধানে আমরা এই জ্ঞান প্রয়োগ করি, সভ্যতাকে উন্নত করার জন্য আমরা এই জ্ঞান ব্যবহার করি। কিন্তু তবুও বুদ্ধিশীল মানুষ-মাত্রই উপলব্ধি করেন, জীবন পূর্ণ হয়ে ওঠেনি, জীবনকে সম্পূর্ণ সমস্যা-মুক্ত করা যায়নি। আমরা এ জগতে দেখি, সবচেয়ে সুন্দর গোলাপটিও ধীরে ধীরে ঝরে যায়। তেমনই সবচেয়ে প্রথিতযশা মানুষও তাঁর প্রিয়তম জড় দেহটি ফেলে রেখে বিদায় নেয়। বড় বড় 'সেলিব্রিটি' রাও শেষ অবধি কেবল ছবি রূপে শোভা পেতে থাকে। সেজন্য এত প্রগতি সত্ত্বেও আমরা কি সমস্যামুক্ত? রবীন্দ্রনাথ, কিশোর কুমার, সত্যজিৎ, রবি ঘোষ — এঁরা কোথায়? — এঁরা তো বিখ্যাত, কিন্তু সমস্যামুক্ত ছিলেন কি?

এই জড় জীবনে আমাদের প্রধান সমস্যাই হচ্ছে মৃত্যু। আমরা বেঁচে থাকার জন্য প্রবল সংগ্রাম করছি, এজন্য বিজ্ঞান, প্রযুক্তিকে প্রয়োগ করছি, কিন্তু শেষ অবধি জীবন থেকে বিদায় নিতে হচ্ছে, জীবন-সংগ্রামে পরাজিত হওয়াই আমাদের যেন ভবিতব্য। মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞা-প্রাপ্ত বন্দী কি কোন কিছুতেই সুখ পায়? সর্বক্ষণ তার আসন্ন ভবিতব্যের শঙ্কা তার মনকে বিচলিত, বিপর্যস্ত রাখে। তেমনই জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, প্রিয়জন-বিচ্ছেদের এই ক্ষণভঙ্গুর জীবনে কেউই দাবী করতে পারে না যে সে প্রকৃতই সুখী। বিশ্বে ভোগ্য সামগ্রীর এত বিপুল আয়োজন সত্ত্বেও যে কোন মানুষকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় সে প্রকৃতই সুখী, পূর্ণ পরিতৃপ্ত কি না, উত্তর হবে অবশ্যই নেতিবাচক। কেবল জড় দেহের পরিতৃপ্তি সুনিশ্চিত হলেই সুখী হওয়া যায় না, কেন না দেহ জড় পদার্থের তৈরী, দেহটি ব্যক্তি নয়।

চিরন্তন, শাশ্বত, আনন্দময় জীবন আমাদের কাম্য, কিন্তু এ জগতে আসল বাস্তবতা হচ্ছে, যে কোন মুহূর্তেই আমাদের দেহের অস্তিত্ব শেষ হয়ে যেতে পারে। মৃত্যুর পরেও কি থাকে জীবনের অস্তিত্ব? এই মহাবিশ্বে আমাদের এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের অর্থ কি? উদ্দেশ্য কি? এই জড় সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি? এই জড় জগতের রূপকার কে? তাঁর রূপ, ব্যক্তিত্ব কেমন? বিশ্ব জুড়ে লক্ষ লক্ষ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় থাকলেও জীবনের এই মৌলিক প্রশ্নগুলির কোন উত্তর সেখানে শিক্ষা দেওয়া হয় না। অথচ এই শিক্ষাই সবচেয়ে জরুরী। এক গভীর সমুদ্রে রেডার-কম্পাস-বিহীন একটি জাহাজ দিক্‌-জ্ঞানহীন নাবিকের দ্বারা পরিচালিত হলে যেমন কখনই পৌঁছতে পারে না গন্তব্যে, তেমনই মৌলিক প্রশ্নগুলির উত্তর

না জেনে জীবন ও সভ্যতা পরিচালিত করতে গেলে ব্যর্থতা, বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। সারা পৃথিবী এখন সেরকম বিপর্যয়েরই সম্মুখীন। মদিরালয়, কসাইখানা, জুয়ার ক্যাসিনো আর পতিতালয় ক্রমবর্ধমান। মানুষ মারণাস্ত্রের পাহাড় তৈরী করছে; আর একটি বিশ্বযুদ্ধ যথার্থভাবে প্রকাশ করে দেবে বাহ্য-জৌলুস-সর্বস্ব জড় সভ্যতার প্রকৃত চেহারা।

সৃষ্টিকে কিভাবে ব্যবহার করতে হয়, তা শিক্ষা দেওয়ার জন্য স্রষ্টা, জীবকুলের পরম সুহৃদ পরমেশ্বর ভগবান বেদ প্রদান করেছেন। বেদ অপৌরুষেয়, কোন ব্যক্তি-বিশেষের রচিত নয়; বেদ মানুষের সকল অনুসন্ধিৎসার সমাধান, সকল মৌলিক প্রশ্নের উত্তর। ভগবদ্গীতা হচ্ছে বেদের সারাতিসার, নির্যাস। ভগবদ্গীতা স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবানের বাণী, সেজন্য তা বিশ্বজনীন। পৃথিবীর যে কোন ব্যক্তি যে কোন স্থানে, যে কোন সময়ে ভগবদ্গীতার বাণী অনুসরণ করে পূর্ণ আনন্দময়, জ্ঞানময় জরা-মরণহীন শাশ্বত জীবন লাভ করতে পারেন। এই ক্ষণস্থায়ী জীবনকে, আমাদের জীবনীশক্তিকে কিভাবে ব্যবহার করলে লাভ করা যায় সমস্যা-মুক্ত পূর্ণ দিব্য জীবন, ভগবদ্গীতা তারই নির্দেশিকা-গ্রন্থ বা ম্যানুয়াল। এজন্য প্রতিটি মানুষের জন্য ও সামগ্রিকভাবে সমগ্র মানব-সভ্যতার জন্য ভগবদ্গীতা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। ভগবদ্গীতাই পৃথিবীর একমাত্র গ্রন্থ, যেখানে সরাসরিভাবে পরমেশ্বর ভগবানের বাণী সংকলিত হয়েছে। ভগবদ্গীতা মানব-সমাজের সংবিধান।

দুর্ভাগ্যবশতঃ বহু ভাষ্যকার ভগবদ্গীতার বক্তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায়ের পরিবর্তে নিজেদের অভিপ্রায় সিদ্ধ করার জন্য ভগবদ্গীতার ভাষ্য প্রকাশ করেছেন। ভগবদ্গীতার মাধ্যমে কেউ জ্যোতির ধ্যান বা যোগসাধনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের চেষ্টা করছেন, কেউ নিরাকার নিরুপাধিক ব্রহ্মের অনুধ্যানে নিয়োজিত হবার জন্য প্ররোচিত করে গীতার শ্লোকগুলির ব্যাখ্যা করছেন, কেউ বা সরাসরি শ্রীকৃষ্ণের ব্যক্তিত্বকেই প্রতীক-এ পরিণত করে 'আমি'-কে, বা জীবকেই ভগবানে পরিণত করেন। তাঁদের কথার-বুনুনি, মিথ্যা যুক্তিজালের মাধ্যমে পাঠককে নিয়ে যাচ্ছেন তমিস্রার গভীরে। এগুলি সবই অপব্যাখ্যা এবং নিজেদের জল্পনা-কল্পনায় বিমুগ্ধ এইসব দুর্বিনীত ভাষ্যকারেরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মাৎসর্য-পরায়ণ, অর্থাৎ ঈর্ষান্বিত। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের শাশ্বত অস্তিত্ব মেনে নিতে অত্যন্ত কুণ্ঠিত। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ যোগ পন্থাটিকে হেয় করে দেখানো, এটিকে ভাবালুতা, 'সেন্টিমেন্টালিজম্' বা ভাবপ্রবণতা বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করা এবং শ্রীকৃষ্ণের ব্যক্তিত্বকে নস্যাৎ করার মাধ্যমে কার্যতঃ ভক্তি-পন্থাকে বিশ্ব থেকে বিলুপ্ত করার জন্য এঁরা অত্যন্ত উদ্গ্রীব, এবং এজন্যই তাঁরা গীতার ভাষ্য লেখেন। অর্থাৎ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের থেকেও এইসব ভাষ্যকারেরা নিজেদেরকে অধিকতর বুদ্ধিমান বলে মনে করেন। এইভাবে তাঁরা মানুষকে বিপথে পরিচালিত করে তাঁদের চরম ক্ষতি সাধন করেছেন ও করছেন।

ভগবদ্গীতায় স্পষ্টভাবে নির্দেশ করা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণের ব্যক্তিত্ব শাশ্বত; তিনি শাশ্বত পরম পুরুষ (*পুরুষং শাশ্বতং দিব্যম্* — ১০/১২), তাঁর নিত্য রূপ রয়েছে (*রূপস্য নিত্যং* — ১১/৫২), তিনি নিরাকার ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয় (*ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্* —

১৪/২৭), অব্যক্ত ব্রহ্মের অনুধ্যানের ফল দুঃখময় (*অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং* ১২/৫)। ভগবদ্‌গীতায় তাঁর চরম উপদেশ-রূপে তিনি বলেছেন ঃ *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ* — ১৮/৬৬, 'সকল ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও। পরম সুহৃৎ পরমেশ্বর ভগবানের কাছে জীবসত্তার এই আত্মসমর্পণই ভগবদ্‌গীতার চরম শিক্ষা, কেন না প্রতিটি জীবসত্তা স্বরূপতঃ ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই নিত্য দাস, এবং ভক্তি হচ্ছে ভগবানের প্রতি জীবের অন্তর-স্থিত শাশ্বত দিব্য ভালবাসার অভিব্যক্তি, জীবের নিত্যবৃত্তি। এই বৃত্তি সুপ্ত রয়েছে প্রত্যেক বদ্ধ জীবের অন্তরে ; সেটাকে বিকশিত করাই পূর্ণতা অর্জনের উপায়।

মানুষ মানসিক জল্পনা-কল্পনা করে কখনও ধর্ম-পন্থা উদ্ভাবন করতে পারে না; ধর্ম স্বয়ং ভগবানের দ্বারা প্রদত্ত আইন — *ধর্মং তু সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রণীতম্*। অথচ আজ দেখা যায় নিত্য-নতুন ধর্ম পন্থা ও 'অবতার'-পুরুষের আবির্ভাব হচ্ছে। বলা বাহুল্য যে এগুলি ধর্ম নয় — *'ধর্মস্য গ্লানি'*, এবং অত্যন্ত শ্রুতিমনোহর মনে হলেও মানুষ এইসব ধর্ম-পথ অনুসরণ করে চরমে কেবল ব্যর্থতাই লাভ করে থাকে। ভ্রান্ত মতবাদের শিকার হয়ে আজকাল মানুষ গেরুয়া পরেও মাংসাহার করছে

সেজন্য স্কুল-কলেজে অবশ্যই ভগবদ্‌গীতার শিক্ষা দান অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, অথচ আজকাল কেবল জড় দেহের ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি-মূলক শিক্ষাদানেই শিক্ষা-ব্যবস্থা সীমাবদ্ধ রয়েছে; সারা বিশ্বে আত্মবিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার জন্য একটিও বিশ্ববিদ্যালয় নেই, যদিও দেহে আত্মাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, আত্মাহীন দেহ চেতনাহীন, মৃত, জড়, পচনশীল।

পৃথিবীর মানব সভ্যতার সমস্ত সমস্যার মূল কারণ হচ্ছে নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞতা; নিজেকে চিন্ময় আত্মা-রূপে জানার পরিবর্তে ক্ষণস্থায়ী ভঙ্গুর জড়-দেহটিকে 'আমি' বলে মনে করা। ভগবদ্‌গীতার জ্ঞান লাভ করলে মানুষ নিজেকে ও ভগবানকে যথাযথ ভাবে জানতে পারে এবং সকল মানুষ, সকল জীবকে ভগবানের অংশ জেনে তাদেরকে ভালবাসতে শেখে। বিশ্বে গীতা জ্ঞান প্রচারিত হলে পৃথিবী থেকে মুছে যাবে যুদ্ধের বিভীষিকা। আমরা ভাবছি সভ্যতা উন্নত হচ্ছে, অথচ বিশ্বে ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে কসাইখানা, মদিরালয়, জুয়ার ক্যাসিনো, আর বেশ্যালয়ের সংখ্যা। সভ্যতা হয়ে পড়ছে কলুষিত। ছাত্র-ছাত্রীদের নৈতিকতা নষ্ট হচ্ছে। ভগবদ্‌গীতার জ্ঞান সমাজে পরিব্যাপ্ত হলে এইসব ক্লেদ হ্রাস পাবে; পাপপ্রবণতা কমবে। ভগবদ্‌গীতায় মানব সভ্যতার সকল সমস্যার সমাধান-সূত্র রয়েছে — ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক, দার্শনিক — সবই। এবং ভগবদ্‌গীতা বিশ্বজনীন। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ্ ও দার্শনিকেরা ভগবদ্‌গীতার আগ্রহী পাঠক। শুধু এটিই যথেষ্ট নয়, ভগবদ্‌গীতার জ্ঞানের ভিত্তিতেই গড়ে ওঠা উচিত সভ্যতা, সমাজ-কাঠামো। তখনই সভ্যতা হবে যথার্থ জ্ঞানোজ্জ্বল, সমৃদ্ধ, শান্তিপূর্ণ।

ইতিপূর্বে ভগবদ্‌গীতার অনেক ইংরাজী সংস্করণ থাকলেও বিশ্বের একজনও তা পাঠ করে শুদ্ধ ভক্তে পরিণত হতে পারে নি, পাপাচার-মুক্ত হয় নি। শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ পূর্বতন আচার্য বর্গের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সম্পূর্ণ অবিকৃতভাবে

ভগবদ্‌গীতার ভাষ্য রচনা করেন ইংরাজীতে — *'ভগবদ্‌গীতা অ্যাজ ইট ইজ'* — যা সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। বিগত ৩০ বছরে শতাধিক ভাষায় অনূদিত হয়ে কোটি কোটি সংখ্যায় তা সারা পৃথিবীতে বিতরিত হয়েছে। সারা পৃথিবীর প্রধান প্রধান শহরে প্রায় ৫০০টিরও বেশি কৃষ্ণতত্ত্ব বিজ্ঞান অনুশীলন কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। আকৃষ্ট হচ্ছেন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ-তরুণীরাও। তাঁরা গড়ে তুলছেন গীতা ক্লাব, ইয়ুথ ফোরাম। ভারতেও কৃষ্ণভাবনার বৈপ্লবিক প্রসারের সূচনা হয়েছে। যেমন পুনে ও মুম্বইয়ের হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী, যাঁদের মধ্যে শত শত ইঞ্জিনীয়ারিং ও মেডিকেল স্টুডেন্ট্‌স্ রয়েছেন— ভগবদ্‌গীতা ব্যবহারিক জীবনে অনুশীলন ও প্রচার করছেন। সারা বিশ্বেই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন ক্রমবর্ধমান।

কোর্স-শিক্ষার্থীর প্রতি

আপনার যদি প্রাথমিক ধারণা এইরকম থাকে, তবুও অনুগ্রহ করে কোর্সটি শেষ করুন :

- ভগবদ্‌গীতা মানুষেরই রচিত। তাই, এটি বিশ্বাস মাত্র, বিজ্ঞান নয়। এতে কোন প্রামাণিক সত্য নেই, আছে কেবল বিশ্বাসের কথা। এসব পড়া কেবল সময়ের অপচয়।
- কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন, রথ, সারথি — এগুলি রূপক। এই রূপকের অন্তরালে জ্ঞান প্রদত্ত হয়েছে। জ্ঞানই আসল, রূপক নয়।
- শ্রীকৃষ্ণের পরিচয় মেলা ভার। আসলে তিনি একজন মহামানব-মাত্র। পরবর্তী কালে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান হিসাবে পূজিত হয়েছেন।
- শ্রীকৃষ্ণ শাশ্বত কেউ নন। আমাদের মতোই তাঁরও জন্ম-মৃত্যু রয়েছে। সুতরাং তিনি আমাদের মতোই।
- শ্রীকৃষ্ণ নিরাকার ব্রহ্মেরই অস্থায়ী রূপ। ভক্তরা এসব বোঝেনও না, জানেনও না, প্রকটের পূর্বে — শ্রীকৃষ্ণ নিরাকার ছিলেন, অপ্রকটের পর তিনি নিরাকার ব্রহ্মে পরিণত হয়েছেন।
- ভগবদ্‌গীতায় আসলে নিরাকার, নির্বিশেষ, নিরুপাধিক অব্যক্ত ব্রহ্ম-তত্ত্ব প্রচারিত হয়েছে। ব্রহ্মই জীব, জীব ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নয়। জীব ও ব্রহ্ম অভেদ তত্ত্ব।
- আমি ভগবান। আপনি ভগবান। প্রত্যেকেই ভগবান।
- ভগবদ্‌গীতায় যোগ-সাধনা, অর্থাৎ অষ্টাঙ্গ-যোগ বা ধ্যান যোগকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। চোখ বন্ধ করে জ্যোতির সাগরে ডুবে থাকা, সমাধিমগ্ন থাকাই চরম সার্থকতা।
- গীতায় প্রধানতঃ কর্ম-যোগই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকের উচিত কর্মবীর হওয়া।

ধ্যান, ধারণা, তপস্যা ও ভক্তি — এসব নিষ্কর্মা কল্পনা-বিলাসীদের জন্য।

- দেব-দেবী ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এসব ব্রহ্মের নানা রূপভেদ। চরমে সব এক — অদ্বৈত। এজন্য যে কোন দেব-দেবীর আরাধনার সংগে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনার কোন পার্থক্য নেই।

- যে কোন ধরণের উপাসনার ফল একই। সব নদী যেমন সমুদ্রে মেশে, সব উপাসনা তেমনই সমাপ্ত হয় একই গন্তব্যে।

- বিজ্ঞানের যত অগ্রগতি হবে, মানুষের অজ্ঞানতা ততই কমে যাবে। কমে যাবে সমস্ত সমস্যাও — যা মানুষকে কষ্ট দিচ্ছে।

- ভগবান হচ্ছেন এক সর্বব্যাপী শক্তি। এই শক্তি সর্বব্যাপী, তাই অনন্ত, অসীম। আর যা অনন্ত, অসীম — তার কোন রূপ, ব্যক্তিত্ব থাকতে পারে না। তাই ভগবান রূপহীন, ব্যক্তিত্বহীন, মন-বুদ্ধিহীন, দেহ-ইন্দ্রিয়হীন এক নৈর্ব্যক্তিক সত্তা।

- আসলে প্রকৃতি— প্রকৃতির নিয়মেই সব কিছু ঘটছে আপনা থেকে। এইসব নিয়ম ঘটনাচক্রে উদ্ভূত— এর কোন নিয়ামক নেই বলে মনে হয়। নিয়ন্তা ভগবানের অস্তিত্ব সন্দেহজনক।

- দৃশ্যমান বস্তু জগতের বাইরে আর কোন জগৎ নেই। এই জগতই সব, এই জীবনই সব। তাই যতদিন বাঁচা যায়, খুশিমত বাঁচাই ভালো।

- জড়ের বিক্রিয়ায় জীবনের সৃষ্টি হয়। মৃত্যুর সাথে সাথে সব শেষ হয়ে যায়। তাই ভগবদ্‌গীতা পড়া ও না পড়ার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

উপরের প্রতিটি বক্তব্য ভ্রান্ত, এবং ঐসব ভ্রান্ত ধারণা ধ্বংস করার জন্যই পাঁচ হাজার বছর পূর্বে ভগবদ্‌গীতা কথিত হয়েছিল।

আপনারও কি এমন সব ধারণা রয়েছে? অথবা নিশ্চয়ই অন্যদের কাছ থেকে এমন কথাবার্তা শুনে থাকেন। ভগবদ্‌গীতায় কি বলা হয়েছে? পড়ুন — খোলা মনে, যুক্তিবাদী মনে।

মুখবন্ধ

ভারতবর্ষ একটি সুপ্রাচীন ধর্মের দেশ, যেখানে বহু ধর্মগ্রন্থের প্রচলন আছে। এই দেশের বহু স্থানে বহু ধর্মসভার অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। কিন্তু এইসব সত্ত্বেও ভারতে দুর্নীতি, অরাজকতা ও নাস্তিকতা বৃদ্ধি পাচ্ছে কেন — যা পারমার্থিক জ্ঞানের অভাবের সূচক?

সাধারণ লোকের এই সরল প্রশ্নটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই সমস্যার আশু প্রতিকারের উপায় অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজন।

আমাদের দেশ ভারতবর্ষে ধর্মগ্রন্থের বহুল প্রচার রয়েছে। আধুনিক যুগের বহু ধর্মভাবাপন্ন পণ্ডিতেরা গীতা ইত্যাদি বৈদিক গ্রন্থের বিভিন্ন ভাষ্য রচনা করেছেন। বহু তথাকথিত ধর্মগুরু এবং প্রচারকেরও উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে যা দেখা যাচ্ছে, তা হচ্ছে — এই সমস্ত প্রচারকগণ ধর্মগ্রন্থের যথার্থ উদ্দেশ্যকে আচ্ছন্ন রেখে, নিজেদের উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবকেই প্রকাশ করেছেন। উদাহরণ-স্বরূপ, ভগবদ্গীতা শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে — যা ঐ গ্রন্থেই সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করা হয়েছে — ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিকট আত্মসমর্পণ করা, যা প্রতিটি জীবের কর্তব্য। ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত ও সখা অর্জুন একটি বদ্ধ জীবের মতো অভিনয় করেছেন। তাঁকে উপলক্ষ্য করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাদের মতো বদ্ধ জীবের নিস্তারের জন্য ভগবদ্গীতার জ্ঞান প্রদান করেছেন। তিনি ভগবদ্গীতার উপসংহারে বলেছেন—

সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢমিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥ *(গীতা ১৮/৬৪)*

অর্জুনকে এই কথা বলে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা দিচ্ছেন।

কিভাবে আত্মসমর্পণ করতে হবে, সেই সম্বন্ধে পুনর্বার নিম্নোক্ত দুটি শ্লোকের মাধ্যমে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান প্রদান করেছেন ঃ

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥ *(গীতা ১৮/৬৫)*

"তুমি আমাতে চিত্ত স্থির কর এবং আমার ভক্ত হও। আমার পূজা কর এবং আমাকে নমস্কার কর। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়। এই জন্য আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করছি যে, এইভাবে তুমি আমাকে প্রাপ্ত হবে।"

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ *(গীতা ১৮/৬৬)*

"সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব । সে বিষয়ে তুমি কোন দুশ্চিন্তা করো না।"

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিভিন্ন যোগপদ্ধতির বর্ণনা করে পরিশেষে বলেছেন, — *যথেচ্ছসি তথা কুরু*, "হে অর্জুন! এখন তুমি যা ঠিক বলে মনে কর, তাই কর।" অর্জুন যথার্থ শিষ্যরূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষা-নির্দেশ গ্রহণ করে তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করেছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের ব্যক্তি স্বাতন্ত্রকে ক্ষুণ্ণ না করে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার তিনি তাঁর উপরেই ন্যস্ত করেছেন। আর অর্জুন বুদ্ধিমান শিষ্যের মতোই বলেছেন, *করিষ্যে বচনং তব*—"তুমি যা বলছ, আমি সেটাই করব—আমি তোমার নির্দেশ পালন করব।" এইভাবে অর্জুনের দৃষ্টান্তের মাধ্যমে আমরা শিক্ষা লাভ করতে পারি যে, গীতাজ্ঞান লাভের চরম সার্থকতা হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করা।

সর্বশেষে ভগবদ্গীতার উপসংহারে ব্যাস-শিষ্য সঞ্জয় সমস্ত কিছু বলার পর, ধৃতরাষ্ট্রকে তাঁর সিদ্ধান্ত জানালেন ঃ

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম॥ *(গীতা ১৮/৭৮)*

এর থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করার মাধ্যমেই জীবের পরম মঙ্গল সাধিত হয়। কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে, বর্তমান যুগের তথাকথিত বহু প্রচারক ও ধর্মগুরুরা ভগবদ্গীতার কদর্থ, অপব্যাখ্যা করে শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করার কথা বর্জন করে, নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিভিন্ন কথা বলে থাকেন। যেমন, কেউ কেউ পরম ব্রহ্মকে নিরাকার বলে বর্ণনা করেন। কেউ বলেন পঞ্চপাণ্ডব বা কুরুক্ষেত্র বলে কিছু নেই, পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ই পঞ্চপাণ্ডব। কারও মতে গীতার উদ্দেশ্য হচ্ছে জন্মভূমি বা দেশের কাছে বা দেব-দেবীদের কাছে আত্মসমর্পণ। আবার কেউ বলেন— 'আমিই ভগবান, আমার কাছে আত্মসমর্পণ কর .....' ইত্যাদি।

কিন্তু এইরকম ভগবদ্গীতার মূল অর্থ বিভ্রান্তকারী বিরূপ ব্যাখ্যা-সমন্বিত গীতা গ্রন্থের প্রচার এবং আলোচনা সভার দ্বারা কিভাবে আমাদের দেশ যথার্থরূপে উপকৃত হতে পারে? সেজন্য ভারতবর্ষে বহুল পরিমাণে গীতার প্রচলন থাকা সত্ত্বেও প্রচুর বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে। পূর্বে গুরুপরম্পরা-ক্রমে প্রাপ্ত জ্ঞান লাভ করে ভক্ত ও মহান আচার্যগণ শাস্ত্রের শুদ্ধ ভাষ্য রচনা করতেন এবং সমাজকে অধঃপতনের হাত থেকে রক্ষা করে ভগবৎ-মুখী করতেন। আমাদের কর্তব্য সেই মহান আচার্যগণের শুদ্ধ ভক্তির অনুকূল ব্যাখ্যা অনুসরণ করা। তবেই

আমাদের জীবন সার্থক হবে।

বর্তমানে ভগবদ্‌গীতার ভাষ্য কোন রাজনৈতিক নেতা, জড়-জাগতিক দার্শনিক বা পেশাদারী লেখক দ্বারা রচিত ও প্রকাশিত হচ্ছে। কিন্তু সেখানে তাঁদের স্বকল্পিত মতেরই বাহুল্য, ফলে সেই ভাষ্যসমূহ সমাদৃত হওয়া সত্ত্বেও মানুষ প্রকৃত গীতাজ্ঞান থেকে বঞ্চিত হয়ে ভগবৎ-বিমুখ হয়ে উঠছেন। শুধু ভারতেই নয়, বিভ্রান্তিকর ভাষ্য সমন্বিত বহু গীতা ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সেই সব গ্রন্থ অধ্যয়নের ফলে সারা বিশ্বে একজনও শুদ্ধ পর্যায়ে উপনীত হতে পারেন নি।

ভগবানের অপার করুণার ফলে ব্রহ্ম-মধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায়ভুক্ত আধুনিক যুগের যুগান্তকারী মহান আচার্য ইস্‌কন-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ পূর্বতন আচার্য্যগণের পদাঙ্ক অবলম্বন করে ভগবদ্‌গীতার যে ইংরেজী ভাষ্য 'ভগবদ্‌গীতা অ্যাজ ইট ইজ' রচনা করেছেন, তা সারা পৃথিবীতে শতাধিক ভাষায় প্রকাশিত হওয়ায় লক্ষ লক্ষ মানুষ ভগবদ্‌গীতার প্রকৃত জ্ঞান উপলব্ধি করে ভক্তিযোগ অবলম্বন করছেন, জীবন সার্থক করতে পারছেন। সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ভক্তিবেদান্ত ভাষ্য-সমন্বিত এই গীতাগ্রন্থ সারা বিশ্বের মানুষকে কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ, সদাচারী ও সুশৃঙ্খল করে তুলছে। অসৎ আচরণ, মাংসাহার, নেশা, জুয়া ইত্যাদি কদাভ্যাস থেকে মুক্ত করে, বেদের মহান শিক্ষা বসুধৈব কুটুম্বকম্‌-এর পরিবেশ সৃষ্টি করছে। এই গীতাগ্রন্থ মানুষকে সরল জীবন যাপনের শিক্ষা দিচ্ছে, এবং তা বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট ছাত্র ও যুবসমাজকে যথার্থ পথ প্রদর্শন করছে। এইভাবে ভগবদ্‌গীতা প্রত্যেকের জীবনের চরম উদ্দেশ্য (কৃষ্ণপ্রেম) লাভের পথে পরিচালিত করার সাথে সাথে লক্ষ লক্ষ মানুষকে পরিশীলিত পারমার্থিক জীবন-যাপনের শিক্ষা দানের মাধ্যমে সমাজের প্রভূত মঙ্গল সাধন করছে। এমনকি বিজ্ঞানীরাও ভগবদ্‌গীতার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন।

বিগত ৩০ বৎসরে ইসকনের প্রচেষ্টায় শ্রীল প্রভুপাদের ভাষ্য সমন্বিত এই গীতা শতাধিক ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং ৪২ কোটিরও বেশি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। আমাদের দেশের অনেক লোক মনে করেন, "আমরা সব জানি, কি পড়ব?" এইভাবে নিজেকে সবজান্তা বলেই হোক, অথবা বিশেষ কোন একটি ধর্মীয় গোষ্ঠীর গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখার জন্যই হোক, অথবা যথার্থ শিক্ষার অভাবেই হোক, এখনও বহু মানুষ ভগবৎ-তত্ত্ব বা কৃষ্ণভক্তি প্রাপ্তির উপায় সম্বন্ধে অজ্ঞ হয়েই রয়েছেন। তাই এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে জন্ম লাভ করেও শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রদত্ত শুদ্ধ ভগবৎ-প্রেম থেকে অনেকেই বঞ্চিত রয়েছেন (স্টেশনের কাছের লোকের ট্রেন ফেল করার মতো!)।

বর্তমান সমাজে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ছাত্র-ছাত্রী তথা যুবসমাজ যেভাবে পথভ্রষ্ট

ও বিভ্রান্ত হচ্ছে, তাতে দেশের ভবিষ্যৎ যে অন্ধকার তা সহজেই অনুমেয়। শুধু যুবসমাজ নয় — প্রতিটি মানুষেরই এই গীতাজ্ঞান উপলব্ধি করে জীবন যাপন করার প্রয়োজনীয়তা আছে। সমাজে ভগবদ্‌গীতার যথার্থ অর্থ, গীতার পরম জ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার জন্য এই 'গীতা স্টাডি কোর্স' শুরু করা হয়েছে।

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপার করুণা ও শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাশীর্বাদে তথা আমাদের পরমারাধ্য গুরুদেবের অনুপ্রেরণার ফলে, গীতার শিক্ষাকে 'গীতা করেস্‌পণ্ডেন্স স্টাডি কোর্স' ও গীতা সেমিনারের মাধ্যমে প্রচার ও প্রসার করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই কোর্সের মাধ্যমে ভগবদ্‌গীতার তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা দেওয়া এবং অপব্যাখ্যা ও বিভ্রান্তিকর মতবাদ খণ্ডন করা হয়েছে। তা ছাড়া গীতাকে যথার্থরূপে প্রকাশ করার মাধ্যমে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির সমাধান করে সুস্থ সমাজ গঠন করার সঙ্গে সঙ্গে সকলের কাছে ভগবৎ-প্রেম প্রাপ্তির উপায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রদর্শিত পন্থায় সুলভ করার প্রয়াস করা হচ্ছে। এই শিক্ষা প্রচলনের দ্বারা পারিবারিক কার্যে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও মানুষ এই মহান দর্শন সম্বন্ধে অবগত হতে পারবেন এবং গীতার শিক্ষাকে জীবনে প্রয়োগ করার অনুপ্রেরণা লাভ করে একটি বিশ্বব্যাপী মহান পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন।

পৃথিবীতে ও ভারতবর্ষে মেধাবী তরুণ-তরুণীদের মধ্যে ভগবদ্‌গীতার প্রতি আকৃষ্ট হবার প্রবণতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। পুনার ইয়ুথ ফোরাম ও মুম্বইয়ের হাজার হাজার স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী গীতা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন ও নিজেদের জীবনে প্রয়োগ করছেন — এদের মধ্যে অনেকেই ইঞ্জিনীয়ারিং ও মেডিক্যাল বিভাগের ছাত্র, রয়েছে বি. টেক, এম. টেক রাও। শ্রীল প্রভুপাদের জন্ম শতবর্ষকে উদ্দেশ্য করে, বহু বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও সারা পশ্চিমবঙ্গে সহস্রাধিক স্কুলে শ্রীল প্রভুপাদের জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। প্রায় ৬ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী অংশ নেয়। গত কয়েক বছর ধরে 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত' ছাত্র-সম্মেলনও সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রীদের সংঘবদ্ধ করে নিয়মিত বৈদিক শিক্ষা লাভের জন্য 'জাগ্রত ছাত্র সমাজ' গঠনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। আশা করি এই সমস্ত কার্যক্রম ছাত্র-সমাজের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করার দিকে সহায়ক হবে এবং জনসাধারণের হিত সাধন করবে।

সমাজের কল্যাণকামী শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক, আইনজীবী, রাজনীতিক, সাংবাদিক, চিকিৎসক সহ নানা পেশার মানুষ, বুদ্ধিজীবীকে আমরা ভগবদ্‌গীতার পরম বিজ্ঞান সম্বন্ধে যথার্থভাবে জানার জন্য আহ্বান করছি। এই জ্ঞান বিপ্লবাত্মক ; উচ্চ-প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান আমাদের সুখ দিতে পারে, কিন্তু তা এই ক্ষণস্থায়ী জরা-মৃত্যুময় জীবনে মরুভূমিতে জলবিন্দুর মতো। মানুষ অসভ্য হয়ে উঠলে এই প্রযুক্তি-জ্ঞান ধ্বংসের কারণ

হয়ে উঠতে পারে। গীতাই দান করে শাশ্বত সুখ, সভ্যতার সকল সংকটের সমাধান।

পরিশেষে শ্রীল প্রভুপাদের ভাষ্য সমন্বিত **শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা যথাযথ** অবলম্বনে এই 'গীতা কোর্স' গ্রন্থটি প্রকাশনা কার্যে বিশেষভাবে সহযোগিতা করার জন্য শ্রীগোবর্দ্ধন গোপাল দাস, শ্রীপাদ মুরারিগুপ্ত প্রভু, শ্রীআনন্দবর্ধন প্রভু ও ভক্তিবেদান্ত বুকট্রাস্টের অন্যান্য ভক্তবৃন্দকে ইসকন প্রচার বিভাগের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

বিনীত—
শ্রীমৎ ভক্তিপুরুষোত্তম স্বামী
ডাইরেক্টর, প্রচার বিভাগ
শ্রীধাম মায়াপুর

এই বিশেষ সংকলনটির কিছু বৈশিষ্ট্য

- এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ কৃত 'শ্রীমদ্ভগবদগীতা যথাযথ' গ্রন্থটি অবলম্বনে সংকলিত।
- মূল আকর গ্রন্থে প্রতিটি সংস্কৃত শ্লোক, শ্লোকের প্রতিটি শব্দের অর্থ, প্রত্যেক শ্লোকের অনুবাদ, এবং বিষয়বস্তুর ভাষ্য বা তাৎপর্য প্রদত্ত হয়েছে। পাঠক বর্গ গীতা কোর্স গ্রেড টু-তে এই অমূল্য গ্রন্থটি পাঠ্য গ্রন্থ (টেক্সট-বুক) হিসাবে পড়বেন। এই সংকলন গ্রন্থটি ঐ মূল গ্রন্থের সরল ও সুললিত সংক্ষিপ্তসার। এখানে মূল শ্লোকগুলি দেওয়া হয়নি; অনুবাদ সরলাকারে দেওয়া হয়েছে। এই গ্রন্থের 'বিশ্লেষণ' অংশগুলি শ্রীল প্রভুপাদ-কৃত মূলগ্রন্থের 'তাৎপর্য'-সমূহের সরলীকৃত সারমর্ম।
- গ্রেড-ওয়ান-এ এই গ্রন্থটি অধ্যয়নের পর শিক্ষার্থীবর্গ গ্রেড-টু-এ মূল গ্রন্থ পাঠ করলে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে তাঁদের গীতা তত্ত্ব-জ্ঞান অধীত হবে; এজন্য গ্রেড-টু -তে তিনটি সহায়িকা গ্রন্থ সিলেবাস বা পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
- অনুশীলনী ও প্রশ্নাবলীর সমস্ত উত্তরগুলি বইয়ের মধ্যেই রয়েছে। প্রতি অধ্যায় পড়ে শিক্ষার্থী তার উত্তরগুলি আয়ত্ত করবেন। তবে এর উত্তর পাঠানোর প্রয়োজন নেই।

মঙ্গলাচরণ

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
স্বয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্॥

অজ্ঞতার গভীরতম অন্ধকারে আমার জন্ম হয়েছিল, এবং আমার গুরুদেব জ্ঞানের আলোকবর্তিকা দিয়ে আমার চক্ষু উন্মীলিত করলেন। তাঁকে জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি।

শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুপাদ, যিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অভিলাষ পূর্ণ করবার জন্য এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন, আমি কবে তাঁর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় লাভ করতে পারব?

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ॥

আমি আমার শ্রীগুরুদেব ও সমস্ত বৈষ্ণববৃন্দের পাদপদ্মে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আমি শ্রীরূপ গোস্বামী, তাঁর অগ্রজ শ্রীসনাতন গোস্বামী, শ্রীরঘুনাথ দাস, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, শ্রীগোপাল ভট্ট ও শ্রীল জীব গোস্বামীর চরণকমলে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আমি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য, শ্রীগদাধর, শ্রীবাস এবং তাঁদের অনুগামী ভক্তবৃন্দের পাদপদ্মে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আমি শ্রীমতী ললিতা-বিশাখা সহ শ্রীমতী রাধারাণী এবং শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায়তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য নাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥

হে মহাবদান্য অবতার! আপনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। আপনি দিব্য কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করেন। আপনি স্বর্ণোজ্জ্বল অঙ্গকান্তি গ্রহণ করেছেন। আমরা আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করছি।

হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে।
গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমোঽস্তু তে॥

হে আমার প্রিয় কৃষ্ণ! তুমি করুণার সিন্ধু, তুমি দীনের বন্ধু, তুমি সমস্ত জগতের পতি, তুমি গোপীদের ঈশ্বর এবং শ্রীমতী রাধারাণীর প্রেমাস্পদ। আমি তোমার পাদপদ্মে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তপ্তকাঞ্চনগৌরাঙ্গি রাধে বৃন্দাবনেশ্বরি।
বৃষভানুসুতে দেবি প্রণমামি হরিপ্রিয়ে॥

শ্রীমতী রাধারাণী, যাঁর অঙ্গকান্তি তপ্তকাঞ্চনের মতো এবং যিনি বৃন্দাবনের ঈশ্বরী, যিনি মহারাজ বৃষভানুর দুহিতা এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী, তাঁর চরণকমলে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাই।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

সমস্ত বৈষ্ণব-ভক্তবৃন্দ, যাঁরা বাঞ্ছাকল্পতরুর মতো সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে পারেন, যাঁরা কৃপার সাগর এবং পতিতপাবন, তাঁদের চরণকমলে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, প্রভু শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য, শ্রীগদাধর এবং শ্রীবাস আদি গৌরভক্তবৃন্দের চরণকমলে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

ভূমিকা

কেন ভগবদ্‌গীতা পড়ব

মানব-সমাজে জ্ঞানের প্রয়োজন। তাই বিশ্ব জুড়ে কত অসংখ্য স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা-সংস্থা প্রভৃতি রয়েছে। এগুলির উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজকে উন্নত করা। আর এই সবের মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতিও হয়েছে। কিন্তু এত উন্নতি ও প্রগতি সত্ত্বেও কেন মানব-সমাজে সব সময় এত বিশৃঙ্খলা ও অস্থিরতা? কেন মানুষ সুখী নয়, সমাজ শান্তিপূর্ণ নয়?

সুস্থ জীবন এবং প্রকৃত সভ্যতার জন্য যথার্থ জ্ঞানের প্রয়োজন। জ্ঞান মানুষের জন্য, পশুদের জন্য নয়। কারণ মানব-জীবনের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য আছে, যা পশুদের নেই। পশুরা কেবল আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুনের মাধ্যমে সুখ খোঁজে। কিন্তু কোন মানুষই কেবল এই সব পাশবিক প্রবৃত্তির মাধ্যমে ইন্দ্রিয়সুখ লাভ করে তৃপ্ত হতে পারে না। কারণ মানব-জীবনের লক্ষ্য উচ্চতর— ভগবৎ-উপলব্ধি। এই উচ্চতর জীবনের উদ্দেশ্যই মানুষকে পশুর থেকে পৃথক করে।

আমরা সকলেই জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধি — এই চার রকম দুঃখের শিকার। বিজ্ঞানী, দার্শনিক, নেতা—কেউই এই সব দুঃখভোগ থেকে নিষ্কৃতি পায় না। স্কুল, কলেজ এবং গবেষণাগারে পাওয়া জড় জ্ঞানের সাহায্যে জীবনের এই মৌলিক সমস্যাগুলি থেকে কি মুক্ত হওয়া সম্ভব? জড় জ্ঞান আমাদের কেবল উন্নত উপায়ে ইন্দ্রিয়ভোগ করতে শেখায়, আর কিছু নয়। আমরা এই জ্ঞানের দ্বারা প্রকৃতিকে শোষণ করে, প্রকৃতির সম্পদকে কেবল ভোগ করতে শিখি। কিন্তু এর ফলেই মানব-সমাজে ভোগবাদের প্রকোপ বাড়তে থাকে, দেখা দেয় অসুস্থ প্রতিযোগিতা, লোভ, অসন্তোষ আর যুদ্ধের দাবানল। ব্যক্তি-মানুষের জীবন ভরে ওঠে দুঃখ, নিঃসঙ্গতা, হতাশা আর অতৃপ্তিতে।

আজ আমরা দেখছি, প্রতিটি দেশ অপর কোন দেশকে ধ্বংস করার জন্য অকল্পনীয় অর্থ ব্যয়ে তৈরি করছে বিস্ময়কর ধ্বংসশক্তি-সম্পন্ন মারণাস্ত্র। এই সবের পিছনে রয়েছে আধুনিক সমাজের সভ্য মানুষ। কিন্তু এইভাবে কুকুর-বিড়ালের মতো ঝগড়া করাই কি এই অমূল্য মানব-জীবন এবং সভ্যতার উদ্দেশ্য? কেবল স্কুল-কলেজে প্রদত্ত জড়ভোগ-তৃপ্তিমূলক তথাকথিত জ্ঞান মানব-সভ্যতাকে

যথার্থ উন্নত করতে পারে না; লাগামহীন অসুস্থ ভোগবাদ নৈতিকতার অবক্ষয়কে রোধ করতে পারে না। মানুষের জীবনে দিতে পারে না প্রকৃত শান্তি ও আনন্দ। বরং ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ভয়ংকর প্রতিযোগিতা সভ্যতাকে করে তোলে সংকটগ্রস্ত।

বিশ্বের তথাকথিত উন্নত দেশগুলি জড় বিদ্যায় অত্যন্ত উন্নত হলেও তাদের সমাজ ধ্বংসোন্মুখ। ক্রমবর্ধমান অপরাধ, বিবাহবিচ্ছেদ, মানসিক অসুস্থতা, পিতা-মাতার প্রতি হিংস্র আচরণ, হিংসা, নেশাসক্তি, হতাশা, আত্মহত্যা — এই সবই বিশ্বের জড় সম্পদে উন্নত দেশগুলির সমাজকে বিধ্বস্ত করছে এবং অবক্ষয়ের পথে নিয়ে যাচ্ছে। সারা পৃথিবী আবার এদেরই অনুসরণ করছে। এইভাবে বিশ্বে প্রকাশ ঘটছে ভগবৎ-বিমুখ এক আসুরিক সভ্যতার, যা মানুষকে পারমার্থিক সম্পদহীন পশুতে পরিণত করছে।

মানব-সভ্যতার যথার্থ উন্নতির জন্য জড় জ্ঞান যথেষ্ট নয়। কেবল **বৈদিক শাস্ত্র-প্রদত্ত পারমার্থিক জ্ঞান** এই জড় জ্ঞানের অপূর্ণতা পূরণ করতে পারে। এটি কোন মতবাদ নয়, দার্শনিকের কল্পনাসৃষ্ট ভাববাদ নয়। এই জ্ঞান পরম সত্য, নিত্য, শাশ্বত, সনাতন। তা পূর্ণ ও অভ্রান্ত। **ভগবদ্‌গীতা** হচ্ছে সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের সারাতিসার।

ভগবদ্‌গীতা কোন নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের জন্যও নয়। তা বিশ্বের প্রতিটি মানুষের জন্য, এমন কি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি জীবের জন্য। বিশ্বের প্রতিটি মানুষ ভগবদ্‌গীতা অধ্যয়ন করে জীবনের অর্থ ও উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে পারে এবং জড়-জাগতিক জীবনের ভয়াবহ অস্থিরতা, উৎকণ্ঠা ও অসুস্থতা থেকে চিরতরে মুক্ত হয়ে লাভ করতে পারে এক প্রকৃত আনন্দময় সুখী জীবন। এই জ্ঞান সমাজে প্রয়োগ করা হলে মানব-সমাজে ভোগবাদের প্রবল তাড়না ও অবক্ষয়ের বেগ প্রশমিত হয়ে বিশ্বসভ্যতা হতে পারে যথার্থ উন্নত — সংযম, শান্তি ও সমৃদ্ধিতে উজ্জ্বল।

কিভাবে ভগবদ্‌গীতা উপলব্ধি সম্ভব

ভগবদ্‌গীতাকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে হলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্‌গীতায় যা বলেছেন, তাঁর সেই মুখনিঃসৃত বাণীকে কোন পরিবর্তন না করে অবিকৃতভাবে গ্রহণ করতে হবে। নিজেদের মনগড়া কল্পিত ব্যাখ্যা দিয়ে ভগবদ্‌গীতাকে বিকৃত করা চলবে না। অসংখ্য পণ্ডিত তাদের নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধি অজ্ঞ মানুষের কাছে জাহির করার জন্য গীতার ভাষ্য রচনা করেছেন। কিন্তু তা পড়ে একজনও কৃষ্ণ-ভক্ত হয়নি। এই রকম অপব্যাখ্যা পাঠ শুধু নিষ্ফল নয়, তা পারমার্থিক জীবনকে বিনষ্ট করে।

কেউ নিজে জল্পনা-কল্পনা করে কখনও প্রকৃত জ্ঞান লাভ করতে পারে না। ভগবদ্গীতার জ্ঞান ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে পরম্পরাক্রমে প্রবাহিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং একজনকে এই দিব্যজ্ঞান দান করেন, তিনি পরবর্তীজনকে দান করেন, তিনিও আবার অন্যজনকে দান করেন। একে বলা হয় পরম্পরা। শুদ্ধ ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান এইভাবে পরম্পরাক্রমে প্রবাহিত হয়ে চলে। গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তা ব্যাখ্যা করেছেন। পরম্পরা ধারার বাইরের সমস্ত জ্ঞান জল্পনা-কল্পনা। সেজন্য যথার্থ পরম্পরা ধারা হতে শুদ্ধ দিব্য জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া উচিত।

এ ছাড়া, শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, কেবল তাঁর শরণাগত ভক্তই তাঁকে উপলব্ধি করতে পারেন — *ভক্ত্যা মামভিজানাতি*, অন্য কেউ নয়। তাই যথার্থ গীতার জ্ঞান লাভ করতে হলে তাঁর কাছ থেকে শ্রবণ করতে হবে, যিনি শুদ্ধ, অনন্যচিত্ত কৃষ্ণভক্ত, যিনি বাস্তবিক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ অনুসারে জীবন যাপন করছেন এবং পরম্পরা ধারায় এই জ্ঞান লাভ করেছেন। এ ছাড়া দৃঢ় শ্রদ্ধাবান হতে হবে; সর্বদা অহঙ্কারে স্ফীত হয়ে সন্দেহ-বাতিকগ্রস্ত হলে চলবে না। ভগবান এই জন্য বীর অর্জুনকে বলেছেন, *শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্, সংশয়াত্মা বিনশ্যতি* — শ্রদ্ধাবানেরা জ্ঞান লাভ করতে পারে, আর যারা সংশয়ী, তাদের অধ্যাত্ম-জীবন বিনষ্ট হয়, তাদের মনুষ্যেতর প্রজাতিতে জন্মাতে হয়। তাই, ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নয়, অর্জুনের মতো শ্রদ্ধাবিনম্র চিত্তে গীতা উপলব্ধি করতে হবে।

ভগবদ্গীতার জ্ঞান নিত্য, পূর্ণ ও অভ্রান্ত, কারণ তা পূর্ণ জ্ঞানময় এবং স্বয়ং ভগবান কর্তৃক প্রদত্ত। বদ্ধ জীবের ইন্দ্রিয় সব সময় মোহাচ্ছন্ন, ত্রুটিপূর্ণ এবং সীমিত। তাই বদ্ধ জীবের জল্পনা-কল্পনা বা মনগড়া তত্ত্ব যতই আকর্ষণীয় হোক না কেন, আসলে তা পূর্ণ জ্ঞান নয়। বদ্ধ জীবের চারটি ত্রুটি সব সময় রয়েছে ঃ

(১) ভ্রম — ভুল করার প্রবণতা ;
(২) প্রমাদ — মায়ার দ্বারা মোহাচ্ছন্ন থাকা ;
(৩) বিপ্রলিপ্সা — প্রতারণা করার প্রবণতা ;
(৪) করণাপাটব — জ্ঞান সংগ্রহে ইন্দ্রিয়গুলির অসম্পূর্ণতা।

বদ্ধ জীব মাত্রেরই এই ত্রুটিগুলি রয়েছে। সেই জন্য কোন মানুষের জল্পনা-কল্পনা বা মনগড়া মতবাদ কখনই নিত্য ও পূর্ণ জ্ঞান নয়। কিন্তু ভগবান স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ; তিনি সমস্ত মায়ামোহ এবং ত্রুটি-অপূর্ণতার অতীত। তাই তিনি যে জ্ঞান দান করেন, তা সর্বকালে সর্বদেশে নিত্যসত্য, পরম পূর্ণ। ভগবদ্গীতায় সেই জ্ঞান প্রদত্ত হয়েছে। ভগবদ্গীতা হচ্ছে সমস্ত বেদ ও উপনিষদের অমৃতময় নির্যাস।

ভগবদ্‌গীতার পাঁচটি মূলতত্ত্ব

ভগবদ্‌গীতায় পাঁচটি প্রধান মৌলিক তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে —

(১) পরমেশ্বর ভগবান (২) জীব (৩) প্রকৃতি (৪) কর্ম এবং (৫) কাল। সংক্ষেপে আমরা এগুলি একটু আলোচনা করে নিতে পারি।

(১) পরমেশ্বর ভগবান

অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে।

— "আমি সমগ্র জড় ও চিন্ময় জগতের সমস্ত কিছুর উৎস। সব কিছু আমার থেকে প্রবর্তিত হয়।" (ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, ভ. গী. ১০/৮)

ভগবান, পরব্রহ্ম, পরমাত্মা বা শ্রীকৃষ্ণ — যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন, তিনি হচ্ছেন সব কিছুর পরম উৎস, সর্ব কারণের কারণ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ। তিনি অসমোর্দ্ধ — তাঁর সমান কেউ নেই, তাঁর ঊর্দ্ধে কেউ নেই। তিনি সকলের পরম সুহৃদ, প্রভু ও নিয়ন্তা। তিনি সর্বব্যাপ্ত ব্রহ্মজ্যোতির প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়। তিনি সমস্ত জড় এবং চিন্ময় জগতের প্রভু ও ভোক্তা। তিনি নিত্য সনাতন পুরাণ পুরুষ। তিনি পূর্ণ এবং স্বরাট। সমস্ত দেব-দেবী তাঁর আজ্ঞাবহ। তিনি সমস্ত অবতারগণেরও উৎস। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চিন্ময়, পরম চেতন; তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি জীবসত্তা, প্রতিটি বস্তু, এমন কি প্রতিটি পরমাণু সম্বন্ধেও পূর্ণ সচেতন। এমন কি তিনি যখন কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যে এই জড় সৃষ্টির মধ্যে অবতীর্ণ হন, তখন তাঁর চেতনা কখনও জড় ভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয় না। জড় এবং চিন্ময় জগতে অস্তিত্বশীল সব কিছুই ভগবান কৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কিত। তাঁকে যোগীরা সর্বভূতে বিরাজমান পরমাত্মারূপে উপলব্ধি করেন, জ্ঞানীরা ব্রহ্মরূপে উপলব্ধি করেন। কিন্তু তাঁর শুদ্ধ ভক্ত তাঁর পূর্ণ স্বরূপে, সচ্চিদানন্দময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণরূপে উপলব্ধি করেন।

(২) জীব

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।

"এই জড় জগতে বদ্ধ সমস্ত জীবসত্তা আমারই সনাতন অংশ।"

(ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, ভ. গী. ১৫/৭)

প্রতিটি মানুষ, উদ্ভিদ, প্রাণী — যাদেরই জীবন বা আত্মা আছে, তাদের বলা হয় জীব। জীবাত্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্য, অবিচ্ছেদ্য বিভিন্নাংশ। সেই জন্য জীব ভগবানের সঙ্গে গুণগতভাবে এক। জীবাত্মা ভগবানেরই মতো নিত্য, জ্ঞানময়, এবং

আনন্দময় — ঠিক যেমন বড় অগ্নিকুণ্ডের একটি ছোট স্ফুলিঙ্গও আগুন। কিন্তু পরিমাণগতভাবে জীব ভিন্ন। ভগবান পূর্ণ, স্বরাট, আর জীব অনুস্বরূপে ক্ষুদ্র এবং পরতন্ত্র।

জীব এবং ঈশ্বরের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। প্রতিটি জীবই স্বরূপতঃ ভগবানের সেবক, ভগবানের নিত্যদাস। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যেমন বলেছেন — **জীবের 'স্বরূপ' হয় — কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'**। জীব যখন কৃষ্ণসেবা বিস্মৃত হয়ে নিজে প্রভু হতে চায়, এবং জড় ভোগবাসনা করে, তখন সে দুঃখময় জড় জগতে অধঃপতিত হয়। এখানে তার কর্ম ও বাসনা অনুসারে সে একটির পর একটি জড় দেহ লাভ করে, এবং অন্তহীন কাল ধরে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হয়। কিন্তু যখন সে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয়, ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন করে, তখন পুনরায় তার চেতনা জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়। অন্যাভিলাষ-শূন্য হয়ে ভক্তিময় সেবার ফলে সে অপ্রাকৃত আনন্দ অনুভব করতে থাকে। এই অবস্থা লাভ তখনই সম্ভব হয়, যখন কেউ ভগবানের দিব্য নামসমূহ প্রতিনিয়ত শ্রবণ-কীর্তনের মাধ্যমে ভক্তিযোগ অভ্যাস করে, কারণ ভগবানের নামসমূহ চিন্ময় এবং ভগবান হতে অভিন্ন। অবশেষে শুদ্ধ চেতনা বা কৃষ্ণচেতনা লাভ করে সে তার নিত্য চিন্ময় স্বরূপে অধিষ্ঠিত হয় এবং দেহান্তে ভগবৎ-ধামে প্রত্যাবর্তন করে।

(৩) প্রকৃতি

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।

— "আমার অধ্যক্ষতায় জড়া-প্রকৃতি স্থাবর-জঙ্গম সমন্বিত এই বিশ্বচরাচর প্রকাশ করে।" (ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, ভ. গী. ৯/১০)

প্রকৃতি দুই রকম — **পরা বা শ্রেষ্ঠা চিন্ময় প্রকৃতি** এবং **অপরা বা নিকৃষ্টা জড়া প্রকৃতি**। পরা বা অপরা — উভয় প্রকৃতিই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শক্তি ('Energy')। জড়া প্রকৃতি হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গা মায়াশক্তি। জড়া প্রকৃতি সত্ত্ব, রজ ও তম— এই ত্রিগুণাত্মিকা এবং জড়া প্রকৃতিতে আটটি উপাদান রয়েছে—মাটি, জল, আগুন, বায়ু ও আকাশ এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার। জড়া প্রকৃতির মাধ্যমে জীবের জড় দেহাদি-সমন্বিত বৈচিত্রময় জড় জগৎ প্রকাশিত হয়। জড় জগৎ অনিত্য, বিনাশশীল। জড় জগতের সৃষ্টি হয়, তারপর কালের প্রভাবে একদিন মহাপ্রলয়ের মাধ্যমে বিনষ্ট হয়। তারপর আবার সৃষ্টি হয়। জগৎ তাই অলীক বা মিথ্যা নয় — তা বাস্তব, কিন্তু অনিত্য। অপরাশক্তি-প্রসূত জড় দেহ বিনাশশীল, অনিত্য, কিন্তু পরাশক্তি-চিন্ময় আত্মা শাশ্বত, অবিনশ্বর।

শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে যাওয়ার ফলে জীব জড়া প্রকৃতির কবলীভূত হয়। বদ্ধ জীব তখন জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা পরিচালিত হয়। এইভাবে সে প্রগাঢ় মায়া বা অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন হয়। কিন্তু যখন কোন জীব শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয়ে ভক্তিযোগ অনুশীলন করে, তখন তার মধ্যে দিব্যজ্ঞান প্রকাশিত হয়। এই দিব্যজ্ঞান-রূপ জ্ঞানাগ্নি সমস্ত গুণজাত কলুষকে ধ্বংস করে। সে তখন তার শুদ্ধ চিন্ময়, গুণমুক্ত অবস্থা পুনরায় প্রাপ্ত হয়। এইভাবে ভগবৎ কৃপায় সে অত্যন্ত শক্তিশালী গুণময়ী বহিরঙ্গা মায়াশক্তিকে সহজেই অতিক্রম করতে সমর্থ হয় এবং জড় বন্ধন হতে মুক্ত হয়।

(৪) কর্ম

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ।

— "ভগবান বিষ্ণুর প্রীতিবিধান করার জন্য কর্ম করা উচিত। তা না হলে কর্ম জীবকে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ করে।"

(ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, ভঃ. গী. ৩/৯)

জীব স্বরূপতঃ চিন্ময় আত্মা এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাস। প্রত্যেক জীবের মধ্যে স্বাধীন ইচ্ছা থাকে। যখন সে এই ইচ্ছার অপব্যবহার করে, তখন সে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মতোই প্রভু ও ভোক্তা হবার বাসনা করে। তার ফলে সে কারাগার বা সংশোধনাগার-স্বরূপ এই জড় জগতে অধঃপতিত হয়। এখানে সে প্রকৃতির সম্পদের প্রভু হওয়ার জন্য সচেষ্ট হয় এবং তা জড় দেহ দিয়ে ভোগ করার চেষ্টা করে। এই জন্য সে কর্ম করে। এই রকম কামনা পূরণের জন্য যে কর্ম করা হয়, তাকে বলা হয় **সকাম কর্ম**। প্রত্যেক কর্ম আবার ফল প্রসব করে। কর্ম করা মাত্রই জীব তার ফলভোগ করার জন্য বাধ্য থাকে। একে বলা হয় **কর্মবন্ধন**। শুভ কর্মের ফলে স্বর্গাদি সুখ লাভ হয়, আর অশুভ পাপকর্মের ফলে দুঃখভোগ করতে হয়। পূর্ব কর্ম অনুসারে বিশেষ ধরনের দেহ লাভ হয়। এইভাবে অন্তহীন কাল ধরে কর্মভোগ চলতে থাকে — যত দিন না জীব ঐকান্তিকভাবে ভগবানের শরণাগত হয়। ভক্তিযোগের মাধ্যমে জীব ভগবানের সেবায় যুক্ত হয় এবং ভগবানের প্রীতিবিধানের উদ্দেশ্যে তখন সে কর্ম করে। এই রকম কর্মে নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি নয়, ভগবানের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বাসনা থাকে। ভক্তিসেবাময় এই রকম কর্মই হচ্ছে নিষ্কাম কর্ম। এই রকম প্রীতিময় সেবা-কর্মের ফলে চেতনা নির্মল হয়, এবং কোটি কোটি জন্মের কর্মফল ধ্বংস হয়। ক্রমশ জীব নিত্য কৃষ্ণদাস-রূপে নিজের আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে এবং চিরতরে

জড়বন্ধন হতে মুক্ত হয়ে তাঁর শাশ্বত স্বরূপে অধিষ্ঠিত হয়।

(৫) কাল

অহমেবাক্ষয়ঃ কালো — "আমিই ক্ষয়হীন অনন্ত কাল।"
(ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, ভ. গী. ১০/৩৩)

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো।

"আমিই জগৎসমূহের ধ্বংসকারী মহাবলশালী কাল।"
(ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, ভ. গী. ১১/৩২)

কালও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শক্তি । কালের নিয়ন্ত্রণের অধীনে জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের মিশ্রণে জড় জগতের যাবতীয় কার্যকলাপ সম্পন্ন হয়। কালশক্তি অনুঘটক হিসাবে সমস্ত জড় বস্তুর ক্রমাগত পরিবর্তন ঘটায়। কালের প্রভাবে জীবদেহের প্রতিনিয়ত রূপান্তর ও বিনাশ ঘটে এবং ভৌতিক জগতের প্রকাশ, স্থিতি ও প্রলয় হয়। কালের প্রভাব কেবল জড় জগতে রয়েছে, অ-জড় অপ্রাকৃত ভগবৎ-ধামে কালের কোন প্রভাব নেই।

ভগবৎ-ধাম

যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।

"আমার সেই পরম ধামে একবার গেলে, আর এই জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না।" (ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, ভ. গী. ১৫/৬)

কোটি কোটি জড় ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে। একে বলা হয় জড় জগৎ। জড় জগতের সমস্ত গ্রহলোকই বার বার জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধিজনিত দুঃখক্লেশে পূর্ণ। আসলে জড় জগৎ হচ্ছে অত্যন্ত ক্লেশময় অন্ধকার কারাগারের মতো। এই হচ্ছে কৃষ্ণসেবা-বিমুখ বদ্ধ জীবের রোগমুক্ত হবার স্থান বা সংশোধনাগার। ভগবান কৃষ্ণ জড় জগতের মাধ্যমে আমাদের ভোগবাসনা পূরণের সুযোগ দান করেছেন। তিনি চান, আমরা যেন এই নশ্বর জগতের অপরিহার্য দুঃখক্লেশ উপলব্ধি করি। তিনি এই জগৎকে বলেছেন — *দুঃখালয়ম্ অশাশ্বতম্* — তা দুঃখের আলয় এবং তা বিনাশশীল। আমরা ভগবানেরই নিত্য, অবিচ্ছেদ্য বিভিন্নাংশ; আমরা স্বরূপত ভগবানেরই মতো জড়াতীত, চিন্ময়। তাই আমাদের চিরনিত্য আলয় হচ্ছে অপ্রাকৃত ভগবৎ-ধাম — ভগবানের আলয়। এই দুঃখময় নশ্বর জড় জগৎ আমাদের নিত্য আশ্রয়স্থান নয়। ভগবান

শ্রীকৃষ্ণের অভিলাষ হচ্ছে, প্রতিটি বদ্ধ জীব যেন ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের মাধ্যমে তাদের চেতনাকে শুদ্ধ করে এবং তাঁর ধামে তাঁর কাছে ফিরে যায় (*তদ্ধাম পরমং মম* — ভ. গী. ১৫/৬)। ভগবৎ-ধামে অগণিত শুদ্ধ ভক্ত পরিবৃত হয়ে ভগবান তাঁর স্ব-স্বরূপে শাশ্বত সনাতন কাল ধরে বিরাজমান।

সেই দিব্য ধামে গমন করলে, তাকে আর এই জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না। ভগবৎ-ধাম অপরা নয়, পরা প্রকৃতির দ্বারা পরিচালিত। সেই বৈকুণ্ঠলোকে কোন হীনতা, অপূর্ণতা নেই; তা সম্পূর্ণভাবে কালের প্রভাব থেকে মুক্ত। সেখানে অতীত বা ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই — সব সময় নিত্য বর্তমান। সেই দিব্যধাম তার নিজের আলোকেই উদ্ভাসিত, তা আলোকিত করার জন্য কোন সূর্য বা চন্দ্রের প্রয়োজন হয় না (*ন তদ্ ভাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ* — ভ. গী. ১৫/৬)। ভগবৎ-ধামে জরা-ব্যাধি-মৃত্যু বলে কিছু নেই; সেখানে জীবন নিত্য, জ্ঞানময় ও আনন্দময়। মানব-জীবনের চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে ভক্তিযোগ অনুশীলন করে দুঃখময় জড় বন্ধন হতে মুক্ত হয়ে, আমাদের নিত্য আলয় ভগবৎ-ধামে ফিরে যাওয়া, আর নিত্যকালের জন্য ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া।

ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠতা

ভগবদ্গীতায় ভগবানকে উপলব্ধি করার জন্য বিভিন্ন প্রকার যোগপদ্ধতি আলোচিত হয়েছে, যেমন — কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ, ভক্তিযোগ ইত্যাদি। কিন্তু প্রতিটি অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ যোগ হিসাবে ভক্তিযোগের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে সকল যোগের চূড়ান্ত পরিণতি হচ্ছে ভক্তিযোগ। অন্যান্য যোগে ভগবানকে কেবল আংশিকভাবে উপলব্ধি করা যায়, অথচ সেগুলি সাধন করা অত্যন্ত কষ্টকর। ভগবান নিজেও সেই কথা বলেছেন (ভ. গী. ১২/৫)। ভক্তিযোগ ভগবানের পূর্ণ উপলব্ধি দান করে, এবং তা অত্যন্ত সহজ ও আনন্দপ্রদ।

'ভক্তি' প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে স্থিত নিত্য বৃত্তি। তা কৃত্রিমভাবে আরোপ করা যায় না। কৃত্রিম ভাবাবেগ দ্বারাও কখনও ভক্তি লাভ করা যায় না।

প্রতিটি জীব স্বরূপতঃ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাস। প্রতিটি জীবের সঙ্গে ভগবানের দিব্য মধুর সম্পর্ক রয়েছে। ভক্তিযোগ হচ্ছে সেই সম্পর্ক জাগরণের পন্থা। শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ প্রভৃতি নয়টি ভক্তির অঙ্গ রয়েছে। ভগবানের শরণাগত হয়ে এগুলি অনুশীলন করলে, অচিরেই অপ্রাকৃত আনন্দের অনুভব হয়। ক্রমশ এইভাবে পূর্ণ কৃষ্ণভাবনাময় হওয়া যায়। দেহান্তে ভগবৎ কৃপায় আমরা শ্রীকৃষ্ণের কাছে ফিরে যেতে পারি, এবং নিত্য স্বরূপ লাভ করতে পারি। কোন লৌকিক ধর্ম দ্বারা তা

লভ্য নয়। তাই অনন্যচিত্তে সম্পূর্ণভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়া — এই হচ্ছে ভগবদ্‌গীতার চূড়ান্ত উপদেশ। ভগবদ্‌গীতার শেষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তাঁর পরম নির্দেশ দান করেছেন, *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ* — "সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণ নাও।"

সনাতন ধর্ম

জলের ধর্ম তরলতা। বরফের ধর্ম শীতলতা। আগুনের ধর্ম তাপ ও আলোকদান। তা হলে জীবের ধর্ম কি? জীবের ধর্ম হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসা, শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা। অংশের কাজই হচ্ছে পূর্ণের সেবা করা। সেবার এই বৃত্তিটি আরোপিত নয়। জলের তরলতা, আগুনের পোড়ানোর ধর্মের মতো এই সেবাভাব আত্মার স্বরূপবৃত্তি। কৃষ্ণসেবাই হচ্ছে প্রতিটি জীবের নিত্য ধর্ম। জড় জগতে অধঃপতিত হয়ে একটি জীবাত্মা একটি গাছের দেহে, একটি কুকুরের দেহে, একটি আমেরিকান বা রাশিয়ান মানুষের দেহে কিংবা হিন্দু বা খ্রিস্টানের দেহে বাস করতে পারে, কিন্তু তাতে তার স্বরূপ ধর্মের কোন পরিবর্তন হয় না। সেই জন্য বেদোক্ত ধর্ম হচ্ছে সনাতন ধর্ম। সনাতন শব্দের অর্থ হচ্ছে নিত্য, অনাদি, শাশ্বত। সনাতন ধর্ম কোন মানুষের সৃষ্টি নয়, কোন গোড়ামিপূর্ণ বিশ্বাস বা মতবাদ নয়। তা সাক্ষাৎ ভগবান কর্তৃক প্রদত্ত — *ধর্মং তু সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রণীতম্*। ভগবদ্‌গীতায় জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল জীবের এই নিত্য ধর্মের বিজ্ঞান আলোচিত হয়েছে। ভগবদ্‌গীতার শিক্ষা তাই শাশ্বত, বিশ্বজনীন — প্রতিটি জীবের প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য।

মানব-জীবনের চরম উদ্দেশ্য

আমরা দেখি জগতে সকলেই উচ্চপদ এবং ভোগৈশ্বর্য লাভের জন্য চেষ্টা করছে। প্রত্যেকেই ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়। কিন্তু এই জগতে আমরা কি ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হবার জন্য এসেছি? এই অমূল্য মানব-জীবনের পরম উদ্দেশ্য কি? কেউ প্রবল চেষ্টার পর হয়ত ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার কিংবা বড় নেতা হতে পারে, কিন্তু মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ঐ সবের আর গুরুত্ব থাকে না — সব শেষ হয়ে যায়। পরে আবার একটি জড় দেহে প্রবেশ করে জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধিরূপ কষ্টভোগ করতে হয়, এবং কঠোর জীবন সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়। এইভাবে অন্তহীন কাল ধরে জাগতিক দুঃখ-দুর্দশা চলতে থাকে।

প্রকৃতপক্ষে জীবনের পরম উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্ম-উপলব্ধি তথা ভগবৎ-উপলব্ধি, যার মাধ্যমে জড় জীবনের দুঃখ-দুর্দশার চির অবসান হয়। ভগবদ্ভক্তি সাধন করে

সুপ্ত কৃষ্ণভাবনা জাগ্রত করা এবং ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়াই হচ্ছে জীবনের অন্তিম উদ্দেশ্য। তার ফলে সমস্ত দুঃখক্লেশ আর সমস্যার চিরতরে অবসান হয়।

একটি মাছকে জল থেকে তুলে এনে অনেক যত্ন করলেও যেমন সে ক্ষণকালও সুখী হয় না, তেমনই এই দুঃখময় জগতে কেউই আসলে সুখী নয়। সকলেই উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা আর দুঃখে জর্জরিত। তাই জগতের বাহ্যিক চাকচিক্য আর জৌলুসে মুগ্ধ না হয়ে, আমাদের গভীরভাবে জীবনের চরম উদ্দেশ্য সাধনে ব্রতী হওয়া উচিত। অপরকেও অধ্যাত্ম-জ্ঞানের সংস্পর্শে এনে তার পরম উপকার সাধন করা উচিত। আর বিশেষত ভারতবাসী হিসাবে আমাদের বিশেষ কর্তব্য হচ্ছে এই সুউন্নত পারমার্থিক জ্ঞান সমগ্র বিশ্ববাসীকে দান করা এবং বিশ্বমানব সভ্যতার যথার্থ কল্যাণ সাধন করা।

গীতা-মাহাত্ম্য

ভগবদ্গীতা স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী। তাই ভগবদ্গীতা পাঠ ও শ্রবণ করলে পূর্ণরূপে পবিত্র হওয়া যায়; সমস্ত পাপ ও জড় কলুষ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। আজকের যুগের ব্যস্ত মানুষের পক্ষে বহু শাস্ত্রচর্চা অসম্ভব। ভগবদ্গীতা হচ্ছে সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের সারস্বরূপ। তাই, কেবল মনোযোগ সহকারে ভগবদ্গীতা পাঠ করলেই জীবনে পরম সার্থকতা লাভ হয়। গীতা-মাহাত্ম্যে সেই কথা বলা হয়েছে ঃ

গীতা সুগীতা কর্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্ বিনিঃসৃতা॥

(গীতা-মাহাত্ম্য — ৪)

"ভগবদ্গীতার বাণী স্বয়ং পুরুষোত্তম ভগবানের মুখনিঃসৃত বাণী। এই ভগবদ্গীতা পাঠ করলে আর অন্য কোন বৈদিক সাহিত্য পড়বার দরকার হয় না। গভীর নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার সঙ্গে নিয়মিতভাবে ভগবদ্গীতা শ্রবণ এবং কীর্তন করলে, আমাদের অন্তর্নিহিত ভগবদ্ভক্তির স্বাভাবিক বিকাশ হয়।"

বর্তমান বিশ্বে সকল মানুষের আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে একটি শাস্ত্র, একক ভগবান, একটি ধর্ম এবং একটি বৃত্তি। ভগবদ্গীতা সেই প্রয়োজন পূরণ করতে পারে। গীতা-মাহাত্ম্যে বলা হয়েছে ঃ

একং শাস্ত্রং দেবকীপুত্রগীতম্ একো দেবো দেবকীপুত্র এব।
একো মন্ত্রস্তস্য নামানি যানি কর্মাপ্যেকং তস্য দেবস্য সেবা॥

(গীতা-মাহাত্ম্য — ৭)

"বিশ্বের সকল মানুষের একক শাস্ত্র হোক দেবকীপুত্র-গীত ভগবদ্‌গীতা, বিশ্ব-চরাচরে একক ভগবান হোন দেবকীপুত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, বিশ্ববাসীর জন্য একক মন্ত্র, একক প্রার্থনা হোক তাঁর দিব্য নাম —

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

এবং সারা পৃথিবীর সকল মানুষের একটাই কর্ম হোক—পরম পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা।"